সমবায় সংগ্রাম

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের মুখপত্র

ই-ম্যাগাজিন | প্রথম সংখ্যা | সেপ্টেম্বর'২০

সূচীপত্র ঃ-----

সম্পাদকীয়

কৃষিঋণ মকুব ও কৃষকের ভবিষ্যৎ

শহর সমবায় ব্যাঙ্ক - সমস্যা ও প্রতিকার

উপদেষ্টা মন্ডলী

মনোরঞ্জন বসু, কমল ভট্টাচার্য্য, রাজেন নাগর, অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার, অশোক রায়

সাধারণ সম্পাদক

তপন কুমার বোস

সম্পাদক

অমর নাথ বেরা

।। সম্পাদকীয় ।।

২৬শে সেপ্টেম্বর নিখিল বঙ্গ সমবায় ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশনের ৫৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস। জেলায় জেলায় সংগঠনের কার্য্যালয় সহ ব্যাংক ভবন আলোকমালায় সজ্জিত করা, সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা, সংগঠনের ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করার মাধ্যমে দিনটি পালিত হবে। দিনটি শুধু আনুষ্ঠানিক দিন নয়। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে রক্ষা করা, নিজেদের জীবন-জীবিকা সুরক্ষিত রাখার সংগ্রামের শপথ গ্রহণেরও দিন।

এই ৫৪তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ফেডারেশনের ওয়েবসাইট ও ফেডারেশনের মুখপত্র সমবায় সংগ্রাম ই-ম্যাগজিন আকারে আত্মপ্রকাশ করলো। ভারতের সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কর্মচারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সর্বপ্রথম এই পদক্ষেপ গ্রহণ করল। যা এক বিরাট পদক্ষেপ হিসাবে পরিগণিত হবে।

এই বছর এই দিনটি এমন সময় পালিত হচ্ছে যখন আমাদের ২০তম রাজ্য সম্মেলন শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই সমস্ত পৃথিবী এক অতিমারি কোভিড ১৯ ভাইরাস এর কবলে পড়ে। আজ অবধি লক্ষ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। মারাত্মক মৃত্যু ভয়ের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক এই রুদ্র মারণ রোগের কাছে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতা অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে। বিজ্ঞান এখনও এই মারণ রোগের কোন প্রতিশেধক আবিষ্কার করতে পারেনি।

এই মারণ রোগের প্রভাব থেকে আমাদের দেশ ও মুক্ত হতে পারেনি। এই রোগ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্বে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের চলতে থাকা আর্থিক সংকটের বোঝা শ্রমজীবী মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছে। রোগের প্রতিরোধের নামে লকডাউন ব্যবস্থা চালু করার মধ্যে দিয়ে অফিস, আদালত, শিল্প, স্কুল, কলেজ, কৃষি সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার, কর্মহীন হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার সংস্কারের নামে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল প্রতিরক্ষা, টেলি-কমিউনিকেশন, বিমানবন্দর সহ সব জলের দরে পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। সমস্ত শ্রাম-আইনগুলি শিল্পপতিদের অনুকুলে পরিবর্তন করা হচ্ছে। সার, বিদ্যুৎ প্রভৃতির উপর থেকে ভর্তুকি তুলে দেওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে গভীর সংকট নেমে এসেছে।

এইসব জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। এই প্রতিবাদ প্রতিরোধ গুলিকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ রূপ দেবার জন্য দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও বিভিন্ন শিল্পের ফেডারেশনগুলি ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে দেশব্যাপী "জাতীয় প্রতিবাদ দিবস" - এর ডাক দিয়েছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রাজ্যের নিজস্ব সমবায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রটির দিকে তাকালে দেখতে পাব যে, এক অব্যবস্থা বিরাজ করছে। ভালো ভালো শক্তিশালী ব্যাঙ্ক গুলির পরিচালক পর্ষদের দুর্নীতি ব্যাঙ্ক গুলিকে রুগ্ন ও দুর্বল করে দিচ্ছে। নির্বাচিত পর্ষদ না থাকায় দৈনিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। কোথাও কোথাও কর্মচারীদের অবসরকালীন সুবিধা প্রদানে বিলম্ব হচ্ছে অথবা দিচ্ছে না। শ্রম ও সমবায় আইনের ধারাগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ভঙ্গ করে ডি.এ. দেওয়া হচ্ছে না। ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা বিচার বিবেচনা না করে বেকার যুবকদের দলীয় স্বার্থে বেআইনিভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে। যা ব্যাঙ্ক এবং ওই সমস্ত যুবকদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই সমস্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যখনই আমাদের সংগঠনের ইউনিয়ন সদস্যরা প্রতিবাদ করেছেন, আইন মানার কথা বলেছেন তখনই তাদের ওপর কর্তৃপক্ষ দমন পীড়ন নামিয়ে আনছেন। এমনকি শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তথাপি আমাদের সংগঠনের সদস্যরা দৃঢ়ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বে রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা সমস্তধরণের সমবায় ব্যাঙ্ককে একত্রিত করে রাজ্যে একটি মাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক গঠন, সমবায় আইনের সংশোধন, সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের জন্য পেনশন, সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন পুনর্বিন্যাসের জন্য, পে কমিটি গঠনের জন্য কোভিড-১৯ ভাইরাস এর হাত থেকে কর্মচারীদের সুরক্ষার জন্য সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে লাগাতার আন্দোলন করে গেছে।

তাই এবারের প্রতিষ্ঠা দিবস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে দেশের শ্রমজীবি মানুষের সংগ্রামের সাথে একাত্ম হওয়া, অন্যদিকে নিজস্ব ক্ষেত্রটির সংকট, নিজেদের জীবন-জীবিকার রক্ষার লড়াই, একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে শামিল হওয়ার ও শপথ নেওয়ার দিন।

নিখিল বঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন দীর্ঘজীবী হোক।

কৃষি ঋণ মুকুব ও কৃষকের ভবিষ্যৎ

শিবপ্রসাদ বাউল

জনতা দল দেশে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর দেশের উপ প্রধান মন্ত্রী পরলোক গত দেবীলালজি কৃষকের স্বার্থে প্রথম ঋণ মকুব ঘোষণা করেছিলেন। ঘটনাটি দেশে আলোড়ন তুলেছিল। বিশেষত কৃষক কূলের মধ্যে। অনেক জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি যারা কৃষি ও সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা মন্তব্য করেছিলেন - " যে ভাবেই হোক কৃষক সমাজ এতদিনে কিছু পেল।" তার পরের বছর কৃষিতে বাজেট পেশ করার সময় কি দেখলাম? দেখলাম কৃষিতে বাজেট পেশে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের ওপর থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি সরকার তুলে নিল। কৃষকের জন্য ঋণ মকুব কত টাকা হয়েছিল? দশ হাজার কোটি টাকা। শতকরা কত জন চাষী উপকৃত হয়েছিলেন? দেশে এখনো শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। তখনকার হিসেব অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যা যদি ১০০ কোটি ধরা হয় তাহলে কৃষকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ কোটি। তার মধ্যে এখনো ৩০-৩৫ শতাংশ কৃষককে কোন ভাবেই ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষি ঋণের প্রাপকদের মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। সম্ভব না হওয়ার কারণ? কারণ হল ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে হলে সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয়। বিশেষত যে জমির ওপর চাষের জন্য যন্ত্র বসবে বা চলবে বা চাষ হবে। সেই জমি বন্ধক রাখতে হবে। দেখা যাবে ঐ পরিমান চাষীর বন্ধক দেওয়ার কোন জমি নেই। হয় তারা বর্গাদার, পাট্টাদার, কিংবা ভূমিহীন চাষী। মূলত এই চাষীরাই পরিবার পরিজন নিয়ে নিজ হাতে চাষ করে থাকে। বাকি থাকল আর দুই ধরণের চাষী। তার মধ্যে একধরণের চাষী যাদেরকে মোটামুটি ভাবে ক্ষুদ্র বা মাঝারি চাষী বলা যায়। যারা নিজেরা মাঠে নামে না কিন্তু মাঠে দাঁড়িয়ে থেকে চাষটা করায়। আর এক ধরনের চাষী হল বড় চাষী। যাদের কাছে চাষ বিলাসিতা মাত্র। চাষ ছাড়াও তারা অন্য প্রফেশন-এর সাথে যুক্ত। তারা বাড়িতে বসেই চাষের কাজের ফরমায়েস করে শ্রমিকদের ওপর। কাজের অগ্রগতির হিসেবটাও নেয় চাষের কাজে যুক্ত শ্রমিকদের কাছ থেকে। তাছাড়াও চাষের ব্যবস্থাটা যতটা সম্ভব যান্ত্রিকীকরন করে নিয়েছেন লেবার ক্রাইসিস-এর জন্য আবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ আবাদের সুবিধার জন্যও। তাছাড়াও এই সব যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য সরকারী ভর্তুকিতে ঢালাও ঋণের ব্যবস্থা আছে। আবার ঋণ মকুব হলে তো কথাই নেই। যান্ত্রিকী করনের জন্য গৃহীত ঋণটাও মকুব হয়ে যাবে। তাই নির্বাচনের দামামা বাজলে কৃষি ঋণ আদায় কমে যায়। শুধু তাই নয় যারা আদায়ের কাজে থাকেন বিশেষত যে সকল ব্যাংক কর্মচারী জড়িত থাকেন তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। আদায়ের গতি বাড়াতে গিয়ে সেই রকমই এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভোটের বাজারে অনুকুল পরিস্থিতি তৈরির লক্ষ্যে মনমোহন জি (প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী) ৭০ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ মকুব করেছিলেন। বলাবাহুল্য তার সুফলও পেয়েছিলেন সেটা ঋণ মকুবের জন্যই হোক বা অন্য কারনের জন্যেই হোক। যাইহোক পরবর্তী কোন নতুন সরকার গঠিত হওয়ার প্রথম বাজেটেই আমরা প্রত্যক্ষ করলাম কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের ওপর থেকে লক্ষাধিক কোটি টাকার ভর্তুকি তুলে নেওয়া হল। দু-দফায় ঋণ মকুবের ফলে কৃষক কুল কতখানি উপকৃত হলেন

বা তাদের কতখানি আর্থিক উন্নতি হল একবার ফিরে দেখা যাক। আমরা যে সকল ব্যাংক কর্মচারী গ্রামীন এলাকায় কৃষি ঋণ দাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত তারা মোটামুটিভাবে লক্ষ্য করেছি যে, যে সকল কৃষক ঋন নিয়ে থাকেন তাদের শতকরা ২৫-৩০ শতাংশ চাষী স্ব-ইচ্ছায় ঋণ পরিশোধ করে থাকেন। কারো অনুরোধ বা উপরোধের অপেক্ষা করে না। পরের ২৫-৩০ শতাংশ ঋণী সদস্যকে একটা তাগাদা বা অনুরোধ করার প্রয়োজন পড়ে। ১০-১৫ শতাংশ দেনী সদস্য বা দেনাদার নানা রকম পারিবারিক দুর্বিপাকে যথা - বাড়ীতে কোন দুঃর্ঘটনা, মেয়ের বিয়ে, ছেলের বা মেয়ের ভালো কলেজে পড়াশোনার জন্য মোটা অংকের ডোনেশন ইত্যাদির কারণে পরিশোধ দিতে দেরী হয়। বাকি রইল ২৫-৩০ শতাংশ দেনাদার। এদের কাছ থেকে ঋণ আদায় করাটাই ব্যাংকের কাছে একটা বড় সমস্যা। এরা ঋণ মকুবের স্বপ্ন দেখে। শুধু স্বপ্নই দেখে না, নিজে সময় মত পরিশোধ না করতে পারার ব্যর্থতা ঢাকতে অন্যদেরকেও স্বপ্ন দেখাবার চেষ্টা করে।

তাহলে প্রকৃত পক্ষে কারা উপকৃত হলেন? প্রথমেই উপকৃত হলো যারা ঋণ মকুবের ফিকিরে থাকেন। আর উপকৃত হলেন যারা দৈব দুর্বিপাকে পরে ঋণ পরিশোধ করতে পারেন নি। তারা সকলেই কিন্তু সে সুযোগ পাননি। কারণ হলো ঋণ মকুবের যে শর্তাবলী বেধে দেওয়া হয়েছিল তাতে অনেকের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েনি। যেমন বলা হয়েছিল কোন একটা আর্থিক বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যারা ঋণ মকুবের আওতা ভুক্ত হবেন। মজার ব্যাপার হল সেই বছরটা ছিল লীপ ইয়ার। সুতরাং ২৯শে ফেব্রুয়ারী যারা ঋণ নিলেন তারা কিন্তু একই মাসে ঋণ নিলেও ঋণ মকুবের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। ঋণ মকুবের শর্তাবলী এত জটিলতা পূর্ণ ছিল যে, তা খাতায় কলমে বাস্তবায়িত হতে প্রায় তিন বছর সময় লেগে গিয়েছিল। সবদিক হিসেব নিকেশ করে দেখা গেল যে শতকরা ৩০-৪০ ভাগের মত কৃষক ঋণ মকুবের সুযোগ পেলেন। এদিকে একশো ভাগ ঋণ গ্রহীতাই জানে তাদের ঋণ মকুব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে অনেক সমবায় সমিতি বা অন্যান্য ব্যাংকের কৃষি শাখায় আজও তার জের রয়ে গিয়েছে অমিমাংসিতভাবে। পরিণতি কী দাড়ালো? পরিনতি দাঁড়ালো প্রথমেই ক্ষতিগ্রস্থ হল দাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা আধিকরীকদের সঙ্গে ঋণ গ্রহীতদের সুসম্পর্কের। দ্বিতীয় ক্ষতিগ্রস্থ হল ঋণ দাদনকারী ব্যবস্থার (Credit Circulation System)।

যতদুর মনে পড়ে সময়কাল ১৯৭৬ সালের বা ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি সচিব মাননীয় পি.ভি. সেন সাহেব এসেছিলেন সমবায় ঋণ আদাযে তদারকি বা পরামর্শ দেওয়ার জন্য। আলোচনা প্রসংগে তিনি মানব শরীরে ব্লাড সার্কুলেশন এর সঙ্গে ইকোনমি তে ক্রেডিট সার্কুলেশন-এর তুলনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "মানব শরীরে রক্ত চলাচল যত ভালো হবে, মানুষের স্বাস্থ্যও তত ভালো থাকবে। ঠিক তেমনিভাবে ইকোনমিতে ক্রেডিট সার্কুলেশন যত ভালো হবে দেশের ইকোনমিক কণ্ডিশনটা তত ভালো থাকবে। আমাদের দেশে কৃষি একটা বড় ক্ষেত্র, অতএব তার স্বাস্থ্য ভালো না হলে দেশ এগোতে পারবে না। তাই ঋণ আদায় ও দাদন দুইই সমান তালে হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু এখানে ঋণ মকুবের ধাক্কায় ক্রেডিট সার্কুলেশন

সিস্টেমটাই ভেঙ্গে পড়র মুখে। যেটুকু বেঁচে আছে তা যারা সময় মত ঋণ শোধ দিয়ে দিয়েছে শুধু তাদের হাত ধরে। তারাও সন্তুষ্ট নয়। তারা ব্যাংক ও সরকারের ওপর ক্ষুদ্ধ। তাদের বক্তব্য কোন রকম তদারকি ছাড়া সময় মত ঋণ পরিশোধ করলে ভাগ্যে কিছু জুটবে না। জুটবে ব্যাংকের প্রতি অসৌজন্য দেখালে বা ঋণ ইচ্ছাকৃত পরিশোধ না করলে। এদিকে যে সকল চাষীরা আদৌ ঋণ ব্যাংক থেকে পায়নি। তাদের হাল কি দাঁড়াল? অর্থাৎ পাট্টাদার, বর্গাদার বা ভুমিহীন চাষী? তারা ব্যাংক বা সমবায় সমিতি থেকে ঋণ পায়নি ঠিকই কিন্তু তাদেরকেও ঋণ নিতে হয়। হয় গ্রামীন মহাজন অথবা দোকান থেকে সার বীজ কেনে সেখানে বস্তা পিছু বাড়তি দাম দিয়ে। ফসল বিক্রির প্রথম টাকাটাই চলে যায় ঐ ঋণ শোধ করতে। সেখানে সুযোগ থাকেনা ইন্সুরেন্স, ঋণ মকুব বা খরা ঝরা, বন্যায় সরকারী কোন সুযোগ সুবিধা। এত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও তারা চাষ করে কীভাবে? তাতে কী আদৌ তাদের লাভ হয়? লাভ তো নিশ্চয় হয়। তাছাড়া বছরের পর বছর এভাবে চাষ করে যাবে কেন? এ ব্যাপারে গ্রাম বাংলায় একটা কথা চালু আছে। কথাটা হল -

খেটো খাটায় দ্বিগুণ পায়
তার অর্দ্ধেক ছাতা মাথায়
ঘরে বসে হাঁকায় বাত
তার ঘরে শুধুই হা-ভাত।

এত দিন এই আপ্ত বাক্য দিয়ে চলছিল ঠিকই কিন্তু বরে বারে সারের ওপর ভর্তুকি তুলে নেওয়ার ফলে সারের দাম যে জায়গায় পৌঁছালো তাতে ঐ সকল কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে থাকল। তাই পরবর্ত্তী প্রজন্মের কাছে চাষের প্রতি অনীহা আসতে থাকল। কারণ চাষে ব্যয় নিশ্চিত, আয় অনিশ্চিত। এমত পরিস্থিতিতে তারা কৃষি কাজ ছেড়ে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে পাড়ি জমাতে থাকল। সেখানেও স্বস্তি মেলেনি। ছ-মাস এক-বছর খুব বেশি হলে দুবছর কাটিয়ে আবার ফিরে চাষের কাজে হাত লাগাতে হয়েছে। কারণ দেশটা কৃষি নির্ভর। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে কাজেই ফিরতে হচ্ছে। কিন্তু চাষের কাজে না আছে উপযুক্ত পরিকাঠামো না আছে উৎপাদিত পণ্যের নির্ভরযোগ্য বাজার। সবটাই ভগবান ভরসা। এদিকে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষত যে দলগুলো দেশ পরিচালনার কাছাকাছি রয়েছে তাদের কৃষি ঋণ মকুবই কৃষকের মোক্ষ লাভের জায়গা হিসাবে ধরে নিয়েছে। তার পরের পরিণতিটা দেখে গ্রামাঞ্চলে কিছু ঘটনার কথা মনে পড়ে। গ্রামের প্রায় অধিকাংশ বাড়িতে বিশেষত একটু বর্ধিষ্ণু পরিবারে বাবা সত্যনারায়ণের পুজো হয়। তাতে পাড়ার অধিকাংশ প্রতিবেশী উপস্থিত থাকেন। পুজো চলাকালীন ঠাকুর মহাশয় প্রনামির থালা বাড়িয়ে দেন তাতে যে যার মত প্রনামি দেন। অনেকেই আবার খুচরো না থাকলে ফলে ইচ্ছে থাকলেও না দিতে পারার কষ্টের কথা বললে ঠাকুর মশাই পথ বাতলে দেন এই বলে যে, থালা থেকেই খুচরো নিয়ে নিতে পারেন। এখন এই সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে কিছু সুযোগ সন্ধানি সিকিটা দিয়ে টাকাটা তুলে নেন। ঠাকুর মশাই থালাতে টকাম টকাম করে পয়সা পড়ার আওয়াজ

শুনে খুবই আহ্লাদবোধ করেন এই ভেবে যে, মানুষগুলি কত ভক্তি প্রবন। কিন্তু হায়! পুজো শেষে গুনে দেখেন থালায় সেই পঁচিশ টাকার বেশি নেই। যা অতীতে পেতেন আরকি। আমাদের কৃষক কুল ও ঠিক একইভাবে যে, আমাদের দেশের নেতারা কি মহান। কৃষকদের কষ্টের কথা ভেবে ঋণ মকুব করে দিল। সবাই না পেলেও কিছু জন হলেও তো পেল। তার পরের যখন সারের দোকানে সার কিনতে গিয়ে নতুন দামের ছেঁকাটা লাগে তখনই বুঝতে পারে সরকার ঋণ মকুবের নামে কি বেকুফটাই না বানিয়েছে।

এইভাবে পেইন কিলার খাইয়ে সাময়িকভাবে ব্যাথার উপশম হয় ঠিকই কিন্তু মূল রোগের কোন চিকিৎসা হয় না, চিকিৎসা না হওয়ার ফলে রোগের যন্ত্রণা আরো গভীর থেকে গভীরতর হয়। তাই কৃষকের স্বার্থে কিছু করতে হলে চটজলদি ফাটকা বাজি দিয়ে কিছু হবে না। চাই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, যা ভবিষ্যতে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সাধন করবে। যেমন -

১। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। বিশেষত খরা প্রবণ এলাকা গুলোয় বর্ষাকালে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য - (ক) বড় বড় জলাশয় তৈরি। বৃটিশ আমলে এরকম অনেক জলাশয় তৈরী হয়েছিল। দুঃখের বিষয় বিদেশী বৃটিশ সরকার যেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল সেটা আমাদের স্বদেশী সরকার স্বাধীনতা লাভের শতবর্ষের কাছাকাছি এসেও বুঝতে পারেনি। বা পারলেও উপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করেছেন। (খ) এছাড়া এলাকায় ঘুরলে দেখা যাবে গ্রামাঞ্চলে আছে অনেক ঝিল, বিল, পুকুর ইত্যাদি আছে। সেগুলো মজে গেছে। সেগুলোকে সংস্কার করলে একদিকে যেমন সেচের জল ধরে রাখা যাবে তেমনি মাছ চাষের পক্ষে খুব সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে। সঙ্গে বাড়বে পর্যটন শিল্প।

২। রাসায়নিক সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ভর্তুকির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

৩। উৎপাদিত পণ্যের সহায়ক মূল্য বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে উদ্‌বৃত্ত ফসলের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। কৃষি পণ্যের বাজারে ফোড়েদের উপদ্রব কমাতে হবে।

৫। সরকারীভাবে শস্য বীমার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। কৃষি ঋণে সুদ ভর্তুকির পরিমান বাড়াতে হবে।

৭। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষি ঋণের সুদে ১০০ শতাংশ ছাড়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮। কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে সমবায় ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং সেজন্য কেন্দ্রীয়স্তরে পৃথক সমবায় দপ্তর থাকা একান্তই আবশ্যক। সমবায়ের আলাদাভাবে একটা সংজ্ঞা আছে ঠিকই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সহযোগীতা, সহমর্মীতা ও সহানুভুতির সমন্বয়ের নামই হল সমবায়। এটা হয়ত আমরা সহজে বুঝতে পারি না। যতটা বুঝতে পারি কো-অপারেশন বললে। কারণ প্রতিটি কাজেই আমরা কো-অপারেশন খুঁজি। তাই কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবি হোক এই কামনা করে শেষ করছি।

শহর সমবায় ব্যাঙ্ক – সমস্যা ও প্রতিকার

অশোক রায়

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের কয়েকটি সমবায় ব্যাঙ্কের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিষেধাজ্ঞা জারি করার খবর সংবাদ মাধ্যমে আসার পর মানুষের মনে সমবায় ব্যাঙ্কের বিষয়ে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে।

কিছুদিন আগে Yes Bank এ ধরনের সমস্যা হলে তড়িঘড়ি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে SBI এগিয়ে এসে বিরাট আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ইতি পূর্বে GLOBAL TRUST BANK উঠে যাওয়ার উপক্রম হলে তাকে Oriental Bank of Commerce এর সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করা হয়।

সংবাদ মাধ্যমে সমবায়ের সাফল্যের কথা লেখা হয় না, সমস্যাকে বহুগুণ বাড়িয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত ১৬/০৮/২০২০ B.R. Act এর 35A ধারা অনুসারে দেশের ৩২টি ব্যাঙ্কের আমানতকারিদের নগদ লেনদেনের উপর ও ব্যাঙ্কের কিছু কাজকরমের বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, ব্যাঙ্কগুলি কিন্তু বন্ধ করে দেয়নি। এর মধ্যে বেশীরভাগ ব্যাঙ্ক আবার ঘুরে দাঁড়াবে। আমাদের রাজ্যের ইউনাইটেড কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, বাগনান ও কলকাতা মহিলা সমবায় ব্যাঙ্ক এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে দেশের শহুরে নিম্ন আয়ের মানুষজন শ্রমিক দোকান মালিক ও মধ্যবিত্তের আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদেই এই সমবায় সমিতিগুলোর জন্ম হয়েছিল। কালক্রমে এই সমিতিগুলো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স পেয়ে শহর সমবায় ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত হয়।

জানা যায় যে গুজরাটের বরোদা (Now Vododora) শহরে ১৮৮৯ সালে Anoyna Sahakari Mandali Co Operative Bank Ltd. দেশের প্রথম সমবায় ব্যাঙ্ক মাত্র ২৩জন সদস্য ও ৭৬ টাকা মূলধন নিয়ে কাজ শুরু করে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মহাজনদের হাত থেকে শহুরে মানুষকে রক্ষা করা। দূরভাগ্য যে এই প্রাচীনতম সমবায় ব্যাঙ্কটিকে ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে B. R. Act এর সেকশন ৩৫ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন বন্ধের নির্দেশ দেয়, তখন বরোদা শহর ও তার আশপাশে ব্যাঙ্কের ১০টি শাখা ছিল ও শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা ছিল ২৬০০০। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে ব্যাঙ্কটি বন্ধ হয়ে যায়।

মনে রাখা দরকার যে পশ্চিম ভারতের বেশীরভাগ শহর সমবায় ব্যাঙ্কগুলো গড়ে উঠেছিল সম্প্রদায় (Cast) ভিত্তিতে।

আমাদের রাজ্যে শহর সমবায় ব্যাঙ্কগুলি গড়ে উঠার পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন। শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের মহাজনী শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে ও নিজেদের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে এই ক্রেডিট সোসাইটিগুলি গড়ে উঠে। কোন কোন জায়গায় প্রগতিশীল মধ্যবিত্তের চেষ্টায় এই ব্যাঙ্কগুলি গড়ে উঠেছে। ভাগীরথীর দুই তীরে, শিল্পোন্নত হাওড়া, হুগলী, দুই ২৪ পরগনা, নদীয়া জেলায় মূলতঃ শহর সমবায় ব্যাঙ্কগুলি গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলায় বেশ কিছু শহর সমবায় গড়ে উঠেছে।

পরিতাপের বিষয় হলো উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে শহর সমবায় ব্যাঙ্কের বিকাশ ঘটেনি। মালদা শহরে একটি ব্যাঙ্ক থাকলেও জলপাইগুড়ি সমবায় ব্যাঙ্কটি লিকুইডেট হয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গে শহর সমবায় ব্যাঙ্কের বিকাশ না হওয়ার কারণ কি সেটা অনুসন্ধানের বিষয়, সমবায়ীরা নিশ্চয় বিশ্লেষণ করবেন। তবে আমার মতে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক শ্লথতার অন্যতম কারণ শহর সমবায় ব্যাঙ্কের অনুপস্থিতি। সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বিকল্প অর্থনীতির পথ উন্মুক্ত করে।

আমাদের রাজ্যের ৪৮টি শহর সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে ১০টি ব্যাঙ্ক রুগ্ন হয়ে পড়ে ২০০০ সাল পরবর্ত্তী সময়ে। ব্যাঙ্কগুলি হলো - ১. বাঁটরা, ২. কাসুন্দিয়া, ৩. বালি, ৪. ভাটপাড়া নৈহাটি, ৫. বরাহনগর, ৬. বোড়াল ইউনিয়ন, ৭. পানিহাটি, ৮. সিউড়ি ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন, ৯. রামকৃষ্ণপুর, ১০. রাণাঘাট।

এই অবস্থায় রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বৃহত্তম সংগঠন নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন রাজ্যের রুগ্ন শহর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির আমানতকারীদের ও কর্মচারীদের রক্ষার্থে একদিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম পদ্ধতি শিথিল করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে দাবি জানানোর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছে রুগ্ন ব্যাঙ্কগুলির জন্য আর্থিক সহায়তার দাবি জানায়। রাজ্য সরকার রুগ্ন ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক অবস্থা খতিয়ে দেখা ও পূণর্জীবনের জন্য রাজ্য সরকারের কি করণীয় তা সুপারিশ করার জন্য রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে তিনজনের একটি এক্সপার্ট কমিটি গঠন করেন যার সদস্য ছিলেন শ্রী বিক্রম সেন, স্পেশাল সেক্রেটারি, ফিন্যান্স ও শ্রী অশোক ঘোষ, ডেপুটী রেজিষ্ট্রার (আরবান ক্রেডিট)। এই কমিটি অতি দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত খতিয়ে দেখে রুগ্ন ব্যাঙ্কগুলির জন্য আর্থিক সহায়তা সহ বিভিন্ন সুপারিশ করেন। রাজ্য সরকার কমিটির সুপারিশ মেনে নিয়ে রুগ্ন শহর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির জন্য মোট ৬৯৮০.৩০ লক্ষ টাকা এককালীন অনুদান হিসাবে রাজ্য সরকারকে দেওয়ার সুপারিশ করেন, যাতে ব্যাঙ্কগুলি ৯শতাংশ CRAR অর্জন করে নেগেটিভ নেটওয়ার্থ কাটিয়ে নিজস্ব ঋণদান করতে পারে। মনে রাখতে হবে ভারতের একটি মাত্র রাজ্য সরকার, যারা রুগ্ন শহর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পূণর্জীবনের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী বছরগুলোতেও কার্যকর ছিল। ভাটপাড়া নৈহাটি সমবায় ব্যাঙ্ক ছাড়া ৯টি ব্যাঙ্ক অনুদান গ্রহণ করলেও কাসুন্দিয়া, বরাহনগর ও রামকৃষ্ণপুর সমবায় ব্যাঙ্ক শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ভাটপাড়া নৈহাটি সমবায় ব্যাঙ্কে আমাদের সংগঠনের নেতৃত্ব সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফলে স্থানীয় পৌরসভার ফাণ্ডকে ব্যবহার করে, NPA আদায় করে ও নতুন নতুন স্কীমে ঋণদাদন করে ব্যাঙ্ককে সবল ব্যাঙ্কে পরিবর্তন করতে পেরেছেন, তার প্রশংসা করেছেন এক্সপার্ট কমিটি।

অশোক ব্যানার্জী কমিটি শুধু আর্থিক সহায়তার কথা বলেন নি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সমবায় দপ্তরের মধ্যে এক্তিয়ারের সীমারেখার কথাও বলেন। সমবায় দপ্তর দেখবেন - গণতান্ত্রিকভাবে ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন, বাই-ল পরিবর্তন, নতুন শেয়ার হোল্ডার গ্রহণ ও তাদের অধিকার সুরক্ষিত করা এবং বার্ষিক সাধারণ সভা

করা। অপরদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে বিষয়ে লক্ষ্য দেবে - Loan and Advance & Investment– নিয়মিত ইন্সপেকশন ও তার রিপোর্টের ভিত্তিতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, শাখা লাইন্সেসিং, অডিটর নিয়োগ, সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাঙ্কের আধিকারিক নিয়োগ ও দুর্বল সমবায় ব্যাঙ্ককে সবল সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ। ধীরে ধীরে ভাটপাড়া নৈহাটি, বালি, বাঁটরা, বোড়াল, রাণাঘাট, সিউড়ি ফ্রেণ্ডস রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিধিনিষেধের বাইরে এলেও পানিহাটি, খড়দহ সহ আরও দুটি ব্যাঙ্ক রুগ্ন বলে চিহ্নিত।

শহর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির রুগ্নতার কারণগুলি হলো - ১. খুব ছোট এরিয়া অফ অপারেশন যদিও বর্তমান আইনে এটা বাড়ানোর সুযোগ আছে, ২. ব্যাঙ্কের বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অনীহা, বেশীরভাগ ব্যাঙ্কের একটি কি দুটি অফিস। ৩. পরিচালকদের ব্যাঙ্ক ও আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব। ৪. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বানিজ্যিক ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য Prudential norms শহর সমবায়গুলিতে কঠোরভাবে প্রয়োগ। ৫. কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে আগ্রহের অভাব, ৬. বেশীরভাগ ব্যাঙ্কের পরিচালকরা রাজনৈতিক ব্যক্তি হওয়ায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না, ৭. কর্মচারীরাও নিজেদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে উদাসীন, ৮. বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুসারে সব শহর সমবায় ব্যাঙ্ককে কোর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় (CBS) নিয়ে আসতে বলা হলেও এখনও অনেক ব্যাঙ্কের কোন অগ্রগতি ঘটেনি।

আমাদের বুঝতে হবে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, অতি আধুনিক দেশী বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে। আমাদের মূলধন হলো আমানতকারী ও শেয়ার হোল্ডারদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক। সেই সম্পর্ক ও দ্রুততর পরিষেবার মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ ও ঋণ দাদন ও আদায় বাড়াতে পারি। ব্যাঙ্কের ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা ও উন্নতি নিশ্চিত হয়।

গত ২৬শে জুন ২০২০ ভারত সরকার অর্ডিন্যান্স জারী করে B R Act ১৯৪৯ এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছেন যে গুলি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও শহর সমবায় ব্যাঙ্কে প্রযোজ্য হবে, এনিয়ে বিভিন্ন মহলের আলাদা বক্তব্য আছে, এই অল্প পরিসরে এনিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই।

আমরা মনে করি সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন করে রাজ্যে একটিমাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক গঠনের মাধ্যমে সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সম্ভব, রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তে সমবায় ব্যাঙ্ককে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।